Vol. 51 | No. 3 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শম্ভু মিত্রের চাঁদ বণিকের পালা: অন্ধকারে আলোর অন্বেষণ

Volume	51
Issue	3
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মো. হারুনুর রশীদ
Published online	June 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i3.12
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i3.12
Pages	১৯১-২০৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

শম্ভু মিত্রের *চাঁদ বণিকের পালা* : অন্ধকারে আলোর অন্বেষণ

Check for updates

মো. হারুনুর রশীদ*

অধিকাংশ মানুষের অবচেতন মনে ধর্মীয় মাহাত্ম্যের প্রভাব একটি সাধারণ বিষয়। বর্তমান যুগের বিরূপ পরিবেশে মুক্তি-আকাঙ্ক্ষিত মানুষের কাছে মিথের শরণও তেমনি পরম সত্য। জীবনবিশ্বাসের অনেকাংশ মিথের সঙ্গে অঙ্গীভূত বলেই মিথই হয়ে আছে মুক্তি-অন্বেষকদের অবিনশ্বর আকর। সাহিত্যিকগণ তাই মিথযুগের চিত্তধর্মকে নিজ যুগে প্রতিস্থাপিত করে মিথকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলেন। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছে মিথিক তাৎপর্যের পাশাপাশি মিথের আকরণে বিধৃত নরনারীর জীবন-অধ্যবসায়ের কাহিনির মূল্য অপরিমেয়। কারণ 'আজকের কালপরিধির মানুষ পেয়েছে চিত্তের অন্তর্দৃষ্টি, সৌন্দর্যবোধের পরম্পরা, অতীন্দ্রিয় অনুভব এবং মূলত বিজ্ঞানদৃষ্টি। ... বিশেষ কোন স্বতঃসিদ্ধ বিধানের প্রতি অন্ধ দায়বদ্ধতা তার নেই ... মিথ বিনির্মাণ এখন আরও গভীরতর মাত্রায় বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত' (আকতার, ১৯৯৯ : ১০)। শিল্পী-সাহিত্যিকগণও দেশ-কালের সংকটে জাতীয় ঐতিহ্য-ইতিহাসের গুপ্ত আলো বিভাসিত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। *মনসামঙ্গল* পূর্ববাংলার একটি বহুল পরিচিত লৌকিক কাহিনি; বাংলার কবি-সাহিত্যিকগণ এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন আপন দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনসূত্র। নাট্যকার শম্ভু মিত্র (১৯১৫-১৯৯৭) বর্তমানের বিপন্নতা থেকে মুক্তি পেতে *চাঁদ বণিকের পালা* নাটকে (রচনা ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৬, প্রকাশ ১৯৭৭) শরণাপন্ন হন মনসা-মিথের। তবে ধর্মের আবরণে প্রচলিত মাহাত্ম্যের বেড়িতে আবদ্ধ নন তিনি। তাঁর এ নাটকে বাংলা দেশজ মিথের পটভূমিতে স্বকালের অন্ধকারে স্বকীয়বোধের, শুভালোকের উদ্ভাসন ঘটেছে। এ নাটকের চাঁদ সদাগর সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূত এক ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। অন্ধকারের দেবী মনসার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম বংশীয় অহমজাত। অন্ধকারের কাছে চাঁদের পতন এ নাটকে যেমন ট্রাজিক পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে তেমনি তার পুনরায় সমুদ্রযাত্রার প্রতিজ্ঞায় প্রজ্বলিত হয় দৃপ্ত পৌরুষের মশাল। এক্ষেত্রে শম্ভু মিত্র সমকালের অন্ধভূমিতে দাঁড়িয়ে দুস্তর, ফেনিল পারাবার পাড়ি দিয়ে পরম আলোর জগতের অন্বেষক। *চাঁদ বণিকের পালা* নাটকটি তাঁর প্রজ্ঞা-উদ্ভূত এবং অন্তহীন তমসায় আলোর প্রত্যয়-অভিজ্ঞান।

২

পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় গণমানসে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি লক্ষণীয়। দেশভাগের ফলে ভারতে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর আগমন, তীব্র খাদ্য সংকট ও বেকার সমস্যার কারণে কলকাতার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। সরকারের প্রতি সর্বত্র দেখা দেয় চরম অসন্তোষ। কারণ সাম্প্রদায়িক সংকট মোচনে দেশ-বিভাজনের সমাধান বাঙালির কাছে একরকম হরিষেবিষাদে পরিণত হয়। ভারতের রাজনৈতিক এই পরিস্থিতিতে শম্ভু মিত্রের চিত্তসংকট

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

জটিল রূপ নেয়। চল্লিশের দশক থেকেই তিনি গণনাট্য সংঘের অন্যতম কর্ণধার। এ গোষ্ঠীতে তিনি ছিলেন একাধারে নট ও নির্দেশক। পুষ্ট হচ্ছিল নাট্যকার হিসেবে তাঁর শিল্পিত চিন্তা। এসময় নাটক রচনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ। তাঁদের নাট্যরচনা সম্পর্কে শ্রী দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'তাঁরা যেন সৃষ্টিযুদ্ধে নেমেছেন।' (জাকিরুল, ২০০৭ : ৬৩) একইভাবে সংকটগ্রস্ত চিত্তলালিত অস্থির সময়কে তুলে ধরতে নাটকই হয়ে ওঠে শম্ভু মিত্রেরও শিল্পিত সত্তার প্রেরণা। তাঁর *ঘূর্ণি* (রচনা ১৯৫০) নাটকের কাহিনির শুরু কোনো এক কর্মমুখর রোববার থেকে। সেখানে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাকেই শোষণমুক্তি সম্ভব, এই বিশ্বাসে নাট্যকার স্থির' (জগন্নাথ, ২০০৫ : ৩১); বিকাশ নামক চরিত্রটি পঙ্গু সমাজের পচা-গলা পরিবেশ দূর করে বিকশিত করতে চায় শোষণহীন, শ্রেণিহীন সমাজ। এসময় তিনি আরো দুখানা নাটক লিখেছেন যা তাঁর ভাষায় 'প্রারম্ভিক নাটক'। সেগুলো হলো — *উলুখাগড়া* (প্রথম মঞ্চস্থ ১৯৫০), এবং *বিভাব* (প্রথম মঞ্চস্থ ১৯৫১)। পূর্ণাঙ্গ নাটক ছাড়াও শম্ভু মিত্র লিখেছেন তিনটি একাঙ্ক : *একটি দৃশ্য, অতুলনীয় সংবাদ* ও *গর্ভবতী বর্তমান*। *একটি দৃশ্যে* দেখা যায় পাপসংকুল সমাজে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় নগেনের। সে অন্ধকারে আলোর সন্ধানে উন্মুখ হয়ে পড়ে। *গর্ভবতী বর্তমানে* গর্ভবতী প্রসব করে না কিছুই। কারণ বর্তমান বড় যন্ত্রণাদায়ক। *অতুলনীয় সংবাদ* নাটকে ফুটে ওঠে তৎকালীন চালিয়াত ও ফাঁপা সমাজের চিত্র।

ষাটের দশকেও রাজনৈতিক তথা নানা সামাজিক সমস্যায় আলোড়িত ছিল ভারতীয় জনজীবন। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ জনজীবনে আরো অস্থিরতা এনে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী বিরোধীরা দ্বিধাবিভক্ত হলে রাজনৈতিক অঙ্গনে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। চীনের মতাদর্শে আলোড়িত নক্‌শালবাড়ির নেতৃত্ব এবং সিপিআই (এম)-এর একাংশের দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। ১৯৬৪ সালে মালদাসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও একটি লক্ষণীয় বিষয়। তাছাড়া পূর্ববর্তী দশকের মতো ষাটের দশকেও অব্যাহত ছিল খাদ্যসংকট। (জাকিরুল, ২০০৭ : ৭৫) এই দশককেও সার্বিক অর্থে বলা চলে প্রবলভাবে ব্যক্তির সংকটের দশক। এসময় (১৯৬৪ থেকে) বহুরূপী নাট্যদলে শম্ভু মিত্র প্রযোজনা করলেন সফোক্লিসের *অয়দিপাউস* এবং রবীন্দ্রনাথের *রাজা*। রাজা অয়দিপাউস পাপের শাস্তিস্বরূপ নিজ হাতে নিজের চোখের আলো নির্বাপণ করে। হতভাগ্য অয়দিপাউস অন্ধকারে খুঁজে পায় প্রশান্তির অভিজ্ঞান, প্রসন্নতার আশীর্বাদ। অন্ধকারের সুকঠিন গাঢ়তায় নিহিত থাকে জীবনের আলোর বীজ — একথা *অয়দিপাউস* এবং *রাজা* নাটকের ক্ষেত্রে সত্য। এই প্রেরণায় শম্ভু মিত্রের চিন্তায় ধরা দেয় দেশীয় নাটকের[২] ভবিষ্য-কল্পলোক। সেখানে *রক্তকরবী* তাঁর প্রেরণা; যেখানে 'যন্ত্রায়িত জীবন এবং মুক্তি দ্বন্দ্বময় আলো-অন্ধকারের চিত্রকল্পে বারে বারে ব্যঞ্জিত হল' (সরোজ, ১৯৯৪ : ৭২)। রবীন্দ্রনাথের আলোর বীজটি অঙ্কুরিত হল শম্ভু মিত্রের মনসামঙ্গল-মিথের আকরণে। চাঁদ বণিকের দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রার মধ্য দিয়ে তিনি তৎকালীন সংগ্রামী মানুষের সমগ্র জীবনস্বরূপ প্রত্যক্ষ করলেন। কিন্তু *মনসামঙ্গলের* কাহিনি নয়, জীবনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তুলে ধরাই হল তাঁর অন্বিষ্ট। ষাটের দশকের উত্তাল ও সংকটাপন্ন সমাজের কথা নানাভাবেই এসেছে নাটকে। নাট্যকারের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রজ্ঞা ও

সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে নাটকে রূপান্বিত হয়েছে। নাটকটি রচনা সম্পর্কে নাট্যকার জানান : 'কেমন করে জানিনা এই চাঁদ সাগরের কাহিনিটা মাথায় এসেছিল এবং মনে হয়েছিল যে এইটা আমাদের এখনকার সঙ্গে আধুনিক কালের সঙ্গে ভয়ানক ভালো মেশে'। (সুবীর, বহুরূপী : ৮৩)

৩

মনসামঙ্গল কাব্য সৃষ্টির পেছনে সামাজিক ইতিহাস বিদ্যমান। অমিয়ভূষণ মজুমদার জানাচ্ছেন, তখন চারশো বছরের পাল সাম্রাজ্য অবক্ষয়িত হওয়ার পরে ধ্বংসগ্রস্ত হয়েছে, সেন বংশের কৌলীনভিত্তিক বর্ণাশ্রম সমর্থক ধর্ম প্রসার লাভ করেছে কিন্তু বাঙালি সমাজে তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়নি। (অমিয়ভূষণ, ১৯৯৭ : ১১৮) পাল শাসনামলে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটেছিল। পালরাজদের অবসানে বাংলায় সূচিত হয় সেন বংশের শাসন। তাঁরা বাংলায় প্রবর্তন করেন ব্রাহ্মণ্যধর্ম। তখন উচ্চতর সমাজ বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে শৈবধর্ম অবলম্বন করে। সমাজে প্রচলিত শৈবধর্ম তাই বৌদ্ধধর্মের রূপভেদমাত্র। সেন রাজারা তৎকালে সমুদ্রবাণিজ্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। লক্ষণীয় :

> ...এই আমলের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস খুবই হতাশাব্যঞ্জক। বৌদ্ধ ধর্মকে দমিত করে দিয়ে মাথা তুলছে ব্রাহ্মণ্যধর্ম। ... সমাজে কৌলীন্যপ্রথা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ... সমাজ ধীরে ধীরে ঘুণেধরা অবস্থায় পরিণত হয়। বাণিজ্যপ্রথা অবলুপ্ত হওয়ায় বণিকদের সামাজিক স্বীকৃতি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। এই সময় লৌকিক দেবদেবীর পূজা স্ত্রীসমাজে ও নীচু সম্প্রদায়ের নরনারীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। মনসাও এইরকম এক লৌকিক দেবী। (জগন্নাথ, ২০০৫ : ৭৩)

এমনই সামাজিক অস্থিরতায় এক উন্মত্ত ঝঞ্ঝালগ্নে *মনসামঙ্গলের* সৃষ্টি। এ কাব্যে মানুষের সঙ্গে দেবতার নতুন সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস লক্ষণীয়। মনসাকে মনে করা হয় অনার্য-কল্পনা-প্রসূত এবং লৌকিক দেবী[২]। এ কারণে শৈবধর্মে আস্থাবান বাণিজ্যপোত-হারা বণিকদের কাছে মনসা হয়ে ওঠে অত্যাচারিত রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক :

> নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' নামক গ্রন্থে সেনবংশের পারিবারিক দেবতা হিসেবে 'সদাশিব'এর অনুমান করেছেন। কিন্তু তুর্কী অভিযানের ফলে সৃষ্ট মধ্যযুগের ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিপর্যস্ত আবহাওয়ায় শিব বেমানান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, 'বস্তুত সাংসারিক সুখ-দুঃখ-বিপদ সম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্ট দেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন যে দেবতা ইচ্ছা-সংযমের আদর্শ, তাহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। (অরবিন্দ, ১৯৮১ : ৫৭)

সেন আমলে রাজপৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্যাদা বাড়তে শুরু করে। (হাননান, ১৯৯১ : ১৮৮) এই সময় সুবর্ণ বণিকেরা সামাজিক শ্রেণি হিসেবে সৎ শূদ্র অর্থাৎ মধ্যম সঙ্করজাত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও এরা পেশায় বণিক এবং মতাদর্শে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতিভূ হতে আকাঙ্ক্ষী হয়। সঙ্গত কারণেই শৈবধর্মের চিন্তালালিত ওইসব ব্যক্তি লৌকিক দেবী মনসার পূজায় অস্বীকৃতি জানায় এবং বংশীয় ঐতিহ্য হিসেবে সমুদ্রপাড়ির অধিকার পুনরুদ্ধারে তৎপর থাকে। *চাঁদ বণিকের পালার* কাহিনির সূচনা

এখানে। বিজয়গুপ্ত প্রণীত *পদ্মাপুরাণ* বা *মনসামঙ্গলের* মতো এ নাটকে কুলীন চাঁদ সদাগর অন্ত্যজ শ্রেণির দেবী মনসাকে[৩] পূজা না করতে বদ্ধপরিকর। মনসা দেবী চাঁদকে পূজার কথা বলতে এলে চাঁদ তাকে হেতালের লাঠি দিয়ে মেরে তাড়িয়ে দেয়। মনসা ক্রুদ্ধ হলে চাঁদের ছয় পুত্র সর্পাঘাতে মারা যায়। কিন্তু তার স্ত্রী সনকা গোপনে মনসার পূজা করত। একদিন সনকার পূজার ঘট চাঁদ দেখে ফেলে লাথি মেরে পূজার ঘট ভেঙে দেয়। সনকা মনসাকে গোপনে পূজা করে পুনরায় লখিন্দর নামক এক পুত্র লাভ করে। কিন্তু শর্ত দেওয়া হয় বিয়ের রাতেই পুত্র সাপের কামড়ে মারা যাবে। চাঁদ সদাগর চৌদ্দ ডিঙা সাজিয়ে বাণিজ্যযাত্রার উদ্যোগ গ্রহণ করলে মনসা চাঁদকে তার পূজা করে বাড়ি থেকে রওনা হতে বলে। চাঁদ পুনরায় তাকে তাড়া করে। ক্রুদ্ধ মনসার নির্দেশে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য-জাহাজ ডুবে যায়। বিয়ের পর বাসর রাতেই সাপের কামড়ে মারা যায় লখিন্দর। বেহুলা মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে ভেলায় ভাসতে ভাসতে দেবরাজ ইন্দ্রের সামনে গিয়ে নৃত্য প্রদর্শন করে দেবতাকুলকে মুগ্ধ করে। মনসার শর্ত অনুযায়ী বেহুলা চাঁদ সদাগরকে পূজা দিতে রাজি করাবে বললে লখিন্দর পুনরায় প্রাণ ফিরে পায়। চাঁদ বাঁ হাতে ফুল ছুঁড়ে পূজা করলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচারিত হয়। বলা যায়, সেন রাজশক্তি যখন ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীকে, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাকে বাংলার মানুষের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছিল তখন বাংলার লোকসমাজ ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর বিপরীতে লৌকিক দেব-দেবী খাড়া করে — এরই প্রতিফলন ঘটেছে *মনসামঙ্গলের* কাহিনিতে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে *মনসামঙ্গলের* মনসা লৌকিক এবং একইসঙ্গে নারীর জীবনাদর্শের জন্য সংগ্রামের প্রতীক।

মুসলিম বিজয়ের পর হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের সংঘর্ষের ফলে মঙ্গলকাব্যগুলোর উদ্ভব ঘটে। (আশুতোষ, ১৯৭৫ : ৬৮) কাব্যগুলোর তাৎপর্যপূর্ণ দিক এই যে, সমসাময়িক ঘটনা, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, টিকে থাকার লড়াইয়ে মানুষের কথাই হয়ে ওঠে মুখ্য, দেবতা সেখানে নিছক রূপকমাত্র। আবার 'খাঁটি মিথের মধ্যে অন্তঃশীল থাকে যে 'ideal eternal history', সেই নির্বস্তুক শাশ্বত ইতিহাস, অপ্রতিরোধ্য ও দুঃসমাধেয় বিরোধের কালাতীত উপাখ্যান চাঁদ সদাগরের কাহিনির মধ্যে বদ্ধমূল' (অশ্রুকুমার, ২০০০ : ১৪১)। কবিসাহিত্যিকগণ তাই মনসামঙ্গলের মধ্যে খুঁজে পান জীবনসংগ্রাম ও শিল্পশৈলীর নানা উপাদান। বেহুলা মিথ ব্যবহারে কবি জীবনানন্দ দাশের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সমালোচক-যুগলের অভিনব শনাক্তি :

> সাম্প্রতিক সামাজিক পরিস্থিতি যখন ব্যর্থতা বিচ্ছিন্নতা দহনযন্ত্রণা এনে দিচ্ছে, লুপ্ত কালীদহ বা চাঁদ সদাগর বা বেহুলার ভেলার মতো অসংখ্য প্রতীক পুনরুদ্ধার করে কবি যেন হারানো স্বপ্নের অমলিন ও সময়াতীত জগতের সঙ্গে যোগাযোগের নতুন সেতু গড়ে তুলতে চাইলেন। (তপোধীর, স্বপ্না, ১৯৯৩ : ১৭৯)

জীবনানন্দ বেহুলাকে দেখেছিলেন বাংলার প্রাকৃতিক রূপকে কিন্তু শম্ভু মিত্র মনসামঙ্গলের মিথপ্রতিমা ও কাঠামোর মধ্যে ভারতবর্ষের জীবনতরঙ্গের সংযোগকে বিন্যস্ত করতে চাইলেন। পূর্বকালের প্রত্নপ্রতিমা তাঁর দর্শনে একালের মুখচ্ছবিতে বিভাসিত হল; মনসা, চাঁদ, বেহুলা, সনকা একালের মানবশরীরে হয়ে গেল অবলীন। কারণ তাঁর কাছে অতীত-ঐতিহ্য বর্তমানের মতোই প্রাণবন্ত। তিনি মনে করেন, অতীতের মধ্যেই অবলোকিত হতে

পারে বর্তমানের স্বরূপ ও দিকনির্দেশনা। তাই *চাঁদ বণিকের পালায়* শম্ভু মিত্র পুরাণ-মিথকে আধুনিক চিন্তার ছাঁদে গড়ে তার আলোময় কণাগুলো জড়ো করে অন্ধকারের বুকে দীপ্ত মশাল প্রজ্বলন করলেন। তাঁর এ নাটকে অতীত ঐতিহ্য যেন বর্তমানকে ছুঁয়ে ভবিষ্যতের দিকে মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত করতে সক্ষম হল।

৪

নাটকের কাহিনির পটভূমি অতীত বাংলার গাঙুর নদীর তীরের চম্পকনগরী। শুরুতেই চাঁদের অনুসারী জনতার প্রতিজ্ঞা, 'ভাইরে আমরা সমুদ্দুরের বুকে পাড়ি দিবই দিব' (শম্ভু, ১৯৯৪ : ৫)। বোঝা যায়, সেন রাজাদের আমলে অর্থবিত্ত, কৌলীন্য প্রতিবন্ধক-রূপে বণিকদের বেগবতী নদীর প্রবাহকে অজস্র শৈবালদামে ভরে দেয়। হতাশা, সংশয়ে ব্যাকুল বণিকদের জন্য নদীটি পাড়ি দেয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। এমনই এক অশুভ ও প্রতিকূল পরিবেশে *মঙ্গলকাব্যের* কবিরা চাঁদ সদাগরের কাহিনি রচনায় ব্যাপৃত হন :

> এই কাহিনীর যখন পত্তন হচ্ছে, তখন বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবার প্রতিকূলতা করে। এই প্রতিকূলতাই মনসার ক্রূর প্রতিশোধপরায়ণতার রূপ ধারণ করেছে। চাঁদ সদাগরকে তাই শেষ পর্যন্ত মান্য করতে হয়েছে মনসাকে। যদি সুস্থ সুখী সংসার চাও তবে মেনে নাও ভয়ংকরকে, রাষ্ট্রীয় প্রধানের নির্দেশকে। (জগন্নাথ, ২০০৫ : ১০২)

ষাটের দশকে ভারতবর্ষে এমনই এক অন্ধকার নেমে আসে, যখন দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু স্বনির্ভরতা এবং স্বাধীন মনোভাব প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। নারীর ভোটাধিকার অর্জিত হলেও সামাজিক অধিকার ন্যায়নীতি ও সাম্যের মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সর্বত্রই নেতিবাচকতার অন্ধকার বিরাজমান। সে সমাজে জ্ঞানের, আলোর দেবতা শিবের পূজাও চলে আবার অন্ধকারের দেবতা মনসার পূজারী নৈরাজ্যবাদীরা আধিপত্য বিস্তার করে। চাঁদের ভাষায় : 'তারা বলে কালটা খারাব, — তাই, শিবেরেও মানো, তারপর ফিরেফির চ্যাংমুড়ি কানীরেও মানো। অর্থাৎ কিনা, — জ্ঞানেরেও পূজা করো, ফির আবার, অজ্ঞানে ভজনা করো। ... '(শম্ভু, ১৯৯৪ : ৬)। এ কালকে কবিশেখর কালিদাস রায়ের (১৮৮৯-১৯৭৫) ভাষায় বলা যায়, 'চম্পক নগরে আজ কানীর চক্রান্ত চারদিকে'। অর্থাৎ, আকাঙ্ক্ষা আর অপ্রাপ্তির বেদনায় এক গাঢ় অন্ধকার সমাজকে যখন গ্রাস করেছে তখন শিল্প-উৎকর্ষে আলোর হাতছানি দেখেন শম্ভু মিত্র। এ সময় রবীন্দ্রনাথের *চার অধ্যায়* মঞ্চস্থ করতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন এই সমাজকে পাল্টাবার পথ খুবই দুর্গম। চাই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। সেজন্য *চাঁদ বণিকের পালায়* লক্ষ করা যায় চাঁদও পূর্বপুরুষের সংগ্রামের পথ পাড়ি দেওয়ার কথা স্মরণ করে সমুদ্র-পাড়ি দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তার পাড়ি দেওয়ার পথে বাধা-বিঘ্নের পাহাড় হয়ে দাঁড়ায় মাণ্ডলিক বেণীনন্দন। রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালকদের মগজ কুরে খাওয়া কীট এই বেণী। চাঁদকে বাণিজ্যযাত্রা থেকে নিবৃত্ত করতে সে প্রথমে মহামাণ্ডলিক বল্লভকে কৌশলে পুতুলের মতোই ব্যবহার করে। কারণ বল্লভ চাঁদ সদাগরের গুরু। বল্লভ বিবেকবোধে দংশিত হয়ে চাঁদকে বাধা দিতে ইতস্তত করে। কিন্তু মহামাণ্ডলিক হয়েও বল্লভ নিম্নপদস্থ বেণীর চক্রান্তকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। বল্লভের উক্তিতে শোনা যায় :

> বেণী নয় চন্দ্রধর, ঘটনার ডরে। জগৎ এ যেন এক অন্ধকার নাকাল নেম্যেছে, তারই ডরে। দেখো না জ্ঞানের সম্মান নাই, বিদ্যার মর্যাদা নাই, সুভদ্র আচার নাই, সুভাষণ নাই, মাংসসুখ ছাড়া কোন সুখ-চিন্তা নাই, — ভুল্যে যাও, চন্দ্রধর, মহৎ কার্যের কথা ভুল্যে যাও। শুধু কোনো মতে নিজেরে বাঁচায়্যা রাখো। আদর্শের পাছে ছুট্যে কোন লাভ নাই (শম্ভু, ১৯৯৪ : ১৬)।

অহংকৃত পৌরুষত্বের অধিকারী চাঁদ তাতে ক্ষান্ত হয় না। তার অনুসারী শিবদাস, ভবদেবরা তাকে উৎসাহিত করে পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য। কেননা '...ঝাঁপ দিয়া নিয়তির হাত হতে ভাগ্যেরে ছিন্যে আনা চাই, এইতো পিতিজ্ঞা' (শম্ভু, ১৯৯৪ : ১৮)। তার প্রধান শক্তি দেবতা শিব। শিবের উপাসনার মাধ্যমে সে নিজেকে কলুষমুক্ত করতে চায়। শম্ভু মিত্রের চাঁদের বলদর্পী ভাব যেন ব্যঞ্জনায়িত হয় শামসুর রাহমানের 'চাঁদ সদাগর' কবিতায় :

> ... কতবার চ্যাঙড়ামুড়ি কানি
> নানা ছলে কেড়ে নিয়ে আমার ঘর্মাক্ত দিনান্তের
> কষ্টার্জিত অন্ন খলখল ব্যাপক উঠেছে হেসে,
> ভেবেছে অভুক্ত আমি, ক্ষুধার করাতে চেরা, ভয়
> পেয়ে হবো নতজানু, ঘটে তার ঠেকাবো আমার
> অবসন্ন মাথা দীন। (শামসুর, ১৯৮২ : ৯)

এরকম অহম্‌বোধে প্রোজ্জ্বল চাঁদ অথচ তার পত্নী সনকা গোপনে মনসার পূজক। একদিন চাঁদ মনসার পূজার ঘট দেখে ফেলে। সনকা সংসারের কল্যাণের অজুহাতে মনসার পূজা করার জন্য চাঁদের অনুমতি প্রার্থনা করে। চাঁদ সনকার গোপনে মনসাপূজার অপরাধের চেয়ে নিজের ঘরে অবিশ্বাসকে বড় করে দেখে :

> কিসে শান্ত হইরে সনকা। মানুষ যে ঘর বান্ধে সে কি শুধু ইঁট কাঠ পাথরের ঢের দিয়া কও? বিশ্বাস যদি না থাকে, — ঘরে এস্যা যদি দেখে, ঘরে তার অন্ধকার কোণে-কোণে সর্প ঘোরে, তাইলে সে সসর্প দালানে কোনদিন সংসারের প্রতিষ্ঠান হয়? সেটা কি কখনো ঘর হয়? ধর্মপত্নী যদি বিশ্বাসঘাতিনী হয় – হায় হায়, ভগবান, মানুষের মন তবে কোথায় ভরসা পাবে? বিশ্বাস কোথায়? (শম্ভু, ১৯৯৪ : ২৩)।

তাঁর এই উক্তি পারিবারিক অশান্তির মূলকে উন্মোচিত করে যেখানে পূজা মুখ্য নয়। সনকা জানে শিব জ্ঞানী দেবতা, আরাধ্য দেবতা। কিন্তু জীবনে যে প্রতি পদে ভয় হয়, সেই ভয় হতে মুক্তি দেবে কে? সনকার বিশ্বাস মনসার পূজা না করার কারণেই যত অমঙ্গল নেমে আসছে। *মনসামঙ্গলের* মধ্যযুগীয় কাহিনি এভাবে ধর্মের প্রলেপ মুছে হয়ে ওঠে ঘর ও জ্ঞানের দ্বান্দ্বিকতা। এখানেই শম্ভু মিত্রের স্বাতন্ত্র্য।

৫

মনসামঙ্গলে বেহুলা-লখিন্দরের গভীর প্রেমের কাছে হার মানে চাঁদের দৃঢ় মানসিকতা। চাঁদ বাম হাতে মনসার পূজা দিলে তার সংসার পুনরায় সুখৈশ্বর্যে ভরে যায়। পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচারিত হয়। কিন্তু *চাঁদ বণিকের পালায়* চাঁদকে পূজা দিতে বাধ্য করার পরে

নাট্যকারের স্বস্তি মেলে না। এজন্য তিনি সন্নিবদ্ধ করলেন বেহুলা-লখিন্দরের বিষপানের ঘটনা। এখানে চাঁদ মনসাকে পূজা দেয়াটা নিছক শিবের কৌতুক বলেই মনে করে। 'স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব অর্থবিত্ত কৌলীন্য — সবকিছু হারালেও চাঁদ শেষ পর্যন্ত হারায়নি জীবনরসের উচ্ছ্বসিত কৌতুক। চাঁদ অন্ধকারের আবেষ্টনীর মধ্যে আত্মসমর্পণ করে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা করে নিয়েছে। ... নতুন করে উদ্দীপিত হওয়ার সন্ধানেই চাঁদ অন্ধকারের মনসার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে' (জগন্নাথ, ২০০৫ : ১০৮)। লখিন্দরের প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্য চাঁদের এই আত্মসমর্পণ খুবই যৌক্তিক । তথাপি পুত্রপরিজন হারিয়ে মনসাকে অগ্রাহ্য করে চম্পকনগরীতে আলোর প্রতিষ্ঠা করতে সংকল্পবদ্ধ হয় চাঁদ। সমগ্র মানবতার কল্যাণ-চিন্তায় ব্যক্তিস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে চাঁদ উজ্জ্বল চরিত্র হয়ে ওঠে। এ চাঁদ শম্ভু মিত্রের একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি।

মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা দেবী হলেও অধিকারহীনা। তার সংগ্রাম আত্মপ্রতিষ্ঠার– যা শেষ পর্যন্ত লৌকিক জীবনাদর্শের সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পৌরাণিক ভাবাদর্শের উচ্চ-কোটির সমাজ-বিধায়কদের কাছ থেকে নিম্নশ্রেণির মানুষের দেবী স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। মনসামঙ্গলের আসল তাৎপর্য এখানেই। কাহিনির এই দ্বন্দ্বসংকুলতায় শম্ভু মিত্রেরও আগ্রহ। কিন্তু *চাঁদ বণিকের পালা* নাটকে প্রধান চরিত্র হিসেবে সংগ্রামী মনসার পরিবর্তে দেখি দৃঢ়চেতা, যুদ্ধ-মনোভাবী চাঁদকে। 'অন্ধকারের জীব'দের বিরুদ্ধে আলোর বর্তিকার সন্ধানে তার বাণিজ্যযাত্রা। অন্ধকারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে চাঁদ সদাগর মনসার চক্রান্ত থেকে ছয় পুত্রকে বাঁচাতে পারে না। তবুও কঠিন সংযমে বুক বাঁধে। ছয় পুত্রকেই বাণিজ্যের অভিযাত্রায় ভাসিয়ে দেবে। তবু এ সংগ্রামে পাড়ি দিতেই হবে তাকে। পাড়ি দেওয়া তাঁর ধর্ম। মহামাণ্ডলিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নোঙরের কাছি কেটে দিতে চায় চাঁদ সদাগর। সে বলে ছয় পুত্র গেছে হয়ত আরো পুত্র যাবে। হয়ত তাদেরও কেউ কেউ যাবে। কিন্তু 'সকলে যদি পাড়ি দেই তাহলে অনেকের পুত্র বেঁচে যাবে। সে-ই বা কম কিসে?' (শম্ভু, ১৯৯৪ : ২৮)। এই সংলাপের মাধ্যমে চাঁদের সকলের কল্যাণের জন্য আত্মস্বার্থ বলি দেয়ার যে মানসিকতার প্রকাশ ঘটে তাতে সে সকলের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। এ চাঁদ *মনসামঙ্গলের* পরাজিত চাঁদ নয়।

সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে ডুবে যায় চাঁদের বাণিজ্যতরী। নিঃস্ব চাঁদ অবশেষে তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে বেণীনন্দনের সঙ্গে সন্ধিতে আসে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, চাঁদ অন্ধকারের দেবী মনসার প্রবল ক্ষমতার বশে অন্ধকারে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু তার এই হেরে যাওয়া মানবভাগ্যের পরাজয়ের গ্লানি বহন করে না। *মনসামঙ্গল* কাব্যে সে হার মেনেছে 'এক বালিকার অতুল্য কৃচ্ছ্রসাধনা ও সিদ্ধির কাছে' (শরীফ, ১৯৭৮ : ৪০৩)। শম্ভু মিত্রের চাঁদ দৃঢ় চেতনায় আরো এক ধাপ অগ্রসর মানুষ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে এ পরাজয় তার কাছে তুচ্ছ। মনসার যে শক্তি 'শিকড়ে শিকড়ে আন্ধারে আন্ধারে' চলে সেই অন্ধকারের মধ্যেই চাঁদ আলোর সন্ধানে ধাবিত হয়। এ চাঁদ অটল, অবিচল। অন্ধকারেও দুই চক্ষু মেলে সে আবার সমুদ্র পাড়ি দিতে চায়। সে খুঁজে পেতে চায় অন্ধকারের পরবর্তী আলোক শক্তি। সংগ্রামসাগরে ডুবে গিয়েও সে অপরূপ দ্বীপ হয়ে পরবর্তী প্রজন্মের আশ্রয়স্থল হতে চায়। তাই শম্ভু মিত্রের চাঁদ পূজা দিতে সম্মত হয় বটে।

তার উক্তিতে ফুটে ওঠে প্রজ্ঞা : '... জীবনের থিক্যা অঙ্ক কষ্যা-কষ্যা শিবাইতে পৌঁছ্যাতে চাই, সেথা শিবাই মেলে না। আর শিবাইয়ের থিক্যা অঙ্ক কষ্যা-কষ্যা জীবনে পৌঁছ্যাতে চাই, সেথা জীবন মেলে না। তবু উন্মাদ হব না আমি, আমি পূজা দিব। ...' (শম্ভু, ২০০৫ : ১২৬)। কিন্তু তার পূজায় পুনর্জীবনপ্রাপ্ত পুত্র লখিন্দর নিজের বেঁচে থাকার বিনিময়ে পিতার পৌরুষত্বের পরাজয়কে মেনে নিতে পারে না। প্রবল আত্মধিক্কারে জর্জরিত হয় সে। অন্যদিকে বেহুলা দেবতাদের যৌনজলসায় স্বামীর প্রাণ ফেরানোর জন্য নিজের অশ্লীল নৃত্য-কে সতীত্ব-সম্ভ্রম হারানো বলে মনে করে। লখিন্দর ও বেহুলা দুজনেই আত্মমুক্তির খোঁজে বিষ খেয়ে আত্মহত্যাকেই শ্রেয়তর মনে করে। তাদের আত্মহত্যার পর চাঁদের আর কিছুই পাবার বা হারানোর জন্য অবশিষ্ট থাকে না। তদুপরি জাতিস্বার্থে পুনরায় পাড়ি দিতে জীবনসমুদ্র খনন করতে চায় সে। *মনসামঙ্গলের* চাঁদ শেষ পর্যন্ত মনসার ক্রূরতায় পরাস্ত কিন্তু *চাঁদ বণিকের পালার* চাঁদ সদাগর আজন্ম-লালিত স্লোগানটির বাস্তবায়নে শেষ পর্যন্ত উন্মুখ — 'পাড়ি দেও,–পাড়ি দেও'। সর্বস্বান্ত হওয়ার পর তার এক সময়ের সহচর ন্যাড়া তাকে পরাজিত সৈনিকের মতো শুধু বেঁচে থাকার পথ খুঁজতে বলে। কিন্তু এ চাঁদ বলিষ্ঠ পৌরুষের অধিকারী। তার মনে হয় শুধু বেঁচে থাকা এটা কোনো পথ হতে পারে না। এ তমসা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেতেই হবে।

বল্লভ-বেণীমাধব প্রমুখ চরিত্রগুলো শম্ভু মিত্রের নিজস্ব সৃষ্টি। মনসা-সম্পর্কিত আধিভৌতিক কল্পনায় আস্থাহীন তিনি। মনসাকে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রশক্তি হিসেবে দাঁড় করাতে উক্ত চরিত্রগুলোর সমাবেশ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধর বল্লভের কথায় সমুদ্রযাত্রা থেকে নিবৃত্ত হয়নি চাঁদ। এই অভিযোগে বল্লভকে সরিয়ে বেণীমাধব নিজেই মহামাণ্ডলিকের পদ দখল করে। তদুপরি চাঁদ সমুদ্রযাত্রার প্রতিজ্ঞায় অটল থাকে। এভাবে *চাঁদ বণিকের পালায়* বেণীমাধবদের মতো রাষ্ট্রীয় শাসকবর্গ হয়ে ওঠে আধিপত্যকামী এবং চাঁদ ও অনুসারীরা হয়ে ওঠে আত্মতা প্রতিষ্ঠাকামী।

৬

চাঁদ বণিকের পালায় সায় বণিকের কন্যা বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ে পাকা হয়। উদ্দেশ্য, সে বিয়ে করে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার সুযোগ পাবে। কিন্তু বিষহরির আজ্ঞা অনুযায়ী লখাইকে বিয়ে দিলে বাসর রাতেই সে মারা যাবে। এক্ষেত্রে মনসার কর্তৃত্বকে স্বীকার করলেন না শম্ভু মিত্র। বাসর ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তির সংলাপ তুলে ধরে গড়মাপের মানুষের বৈশিষ্ট্য :

> ঠিক ঠিক। আজকাল গালগর্ভ বচনের ধ্বজার আড়ালে কালসর্প ঘুরাফিরা করে। কখন যে কোথা বিষ ঢালে তাল পাওয়া যায়নাক।
>
> অপর দিক থেকে : ... আমরা তো এতগুলা লোক আছি, সকলে একত্র হল্যে কালসর্প ঠেকাতে পারিনে? কও? (শম্ভু, ১৯৯৪ : ৮৮)

দ্বিতীয় উক্তিটি প্রমাণ করে কোনো অলৌকিকতায় বিশ্বাসী নন শম্ভু মিত্র। ন্যাড়ার কথিত 'অন্ধকার যুগ'ই সমস্ত ঘটনার মূল। *চাঁদ বণিকের পালায় মনসামঙ্গলের* মতো অলৌকিক কোনো মহিমা নেই। এখানে তারাপতি কর্মকারকে টাকার লোভ ও ভয় দেখিয়ে বাসরঘরে

সাপ ঢোকার ছিদ্র রাখা হয়েছে, ভয়িলকে টাকা ও মদের লোভ দেখিয়ে আনা হয়েছে যে বাসরঘরে সাপ ঢোকানোর ব্যবস্থা করবে। লখিন্দর তার বাসরঘরে নগরীর মালিন্যমুক্ত পরিবেশ প্রত্যক্ষ করে। সে বেহুলাকে বলে : '... ঐ দেখ নীচে চম্পকনগরী। এতো দূর থিক্যা মনে লাগে যেন কতো শান্ত, স্নিগ্ধ। অথচ নিকটে যাও — কি নিষ্ঠুর, বীভৎস নগরী' (শম্ভু, ১৯৯৪ : ৯৩)। শম্ভু মিত্র বাসরঘরে দর্শককে বেহুলাকে চেনার, আপন করে নেয়ার সুযোগ করে দেন — যেখানে তার মনোহারিণী, লাবণ্যময়ী, অনুগামিনী রূপটি ফুটে ওঠে। সুখের এ মুহূর্তে লখার মনে হয় ঈশ্বর সত্য। অন্যদিকে চাঁদ সদাগর ও সনকা এ সময় মদ্যপানে রত হয়ে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে চায়। তারা দুজনে নিজেদের পরাজিত ভগ্নস্তূপের সঙ্গে তুলনা করে। অবশেষে মনসারূপী চক্রান্তকারীদের দ্বারা সর্পদংশনে মৃত্যু হয় লখিন্দরের। সনকা এখানে বিষ্ণু দে'র কবিতার মতো 'আর্কেটাইপাল বাঙালি মা' (*এবং লখিন্দর*, বিষ্ণু দে)। সন্তানের সুখাসুখের বৃত্তের বাইরে সে যেতে পারে না। লখিন্দরকে নিয়েই তার চিন্তা ও শঙ্কা একান্তই মাতৃত্বসুলভ। লখিন্দরের মৃত্যুর জন্য সে পূজ্যদেবী মনসাকে বেহুলারূপে দেখতে পায় এবং তাকেই দায়ী করে: 'দূর হ, দূর হ, এই মুহূর্তেই তুই দূর হয়্যা যাবি চম্পকনগরী থিক্যা। রক্তখাকী মনসা রাক্ষসী, বৌ সেজ্যে লখায়েরে ছিনে নিতি এয়্যেছিস। ছিনে নিবি! — তুই ওরে দংশ্যেছিস ...' (শম্ভু, ১৯৯৪ : ১১০)। এখানে চিরন্তন সংস্কারের ও ভীতির বশীভূত সনকা। কিন্তু বেহুলা প্রেমালোকে মরণ-আঁধারকে জয়[৪] করতে আশায় বুক বাধে। এই বেহুলা হচ্ছে দেশপ্রেমের প্রতীক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বেহুলা' কবিতায় যেভাবে দেখি 'গাঙুরের জলে ভাসে বেহুলার ভেলা', তার মধ্যে ভাসে যেন স্বদেশ আমাদের। বেহুলার প্রতিজ্ঞা দেশপ্রেমী মানুষেরও প্রতিজ্ঞা– মৃতকল্প স্বদেশকে আমরা বাঁচাব। বেহুলার প্রেমশক্তির পরাকাষ্ঠায় মৃত্যু নতজানু হয়, রক্ষা পায় স্বদেশ। কিন্তু ততদিনে অসম্মানের ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে বণিক বংশ, সম্ভ্রম খুইয়েছে বেহুলা নিজেও। প্রদীপগুলো ঢেকে রেখেছে যেন কলঙ্কের কালো ছায়া। সেই ছায়া মুছে দিতে তখনই বেহুলা-লখিন্দরের আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত। এ আত্মহত্যা আলোর অন্বেষণে অন্ধকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এ মৃত্যু যেন কালো জগতে নিষ্কলঙ্ক আলো ছড়াতে এক উজ্জ্বল উষার জন্ম দেয়।

৭

বিভিন্ন সাহিত্যিক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে মনসা-চাঁদের কাহিনিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছেন। বিজন ভট্টাচার্য যেভাবে *জীয়নকন্যা* (১৯৪৮) নাটকে বেদেদের দেশ নন্দনপুরকে অণুভারতবর্ষ করে তুলেছেন, *চাঁদ বণিকের পালায়* চম্পক নগরী তেমনি ভারতবর্ষ হিসেবে গণ্য হয়েছে। *জীয়নকন্যাতে* একটি সাপ উলূপীর হাতে ছোবল মেরে মুহূর্তে পালিয়ে যায় অন্ধকারে। নাটকের শেষে পুনর্জীবিত উলূপীই হয়ে ওঠে ভারতবর্ষ। সাম্রাজ্যবাদের বিষদংশনে প্রাণ হারিয়েছিল সেই ভারতবর্ষ (অশ্রুকুমার, ২০০০ : ১৫৬)। *মনসামঙ্গলের* মতো *চাঁদ বণিকের পালায়* চাঁদ সদাগর হেঁতালের লাঠি নিয়ে সাঁতালি পর্বতের ওপর লোহার বাসর ঘর নির্ভীক পুরুষোচিত ভঙ্গিমায়[৫] পাহারা দেয়। এখানে তার সহকর্মী সনকা। এখানে বাসরঘরটি যেন স্বদেশ, আর তার নাগরিকদের রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

কতোয়ালরূপী চাঁদ-সনকা। নিয়তির অমোঘ বিধানের মতো লখিন্দর সর্পদংশনে মারা যায়। কিন্তু *মনসামঙ্গলের* চাঁদের মধ্যে ছিল গোঁয়ার্তুমি, *চাঁদ বণিকের পালায়* রয়েছে যৌক্তিকতায় উত্তীর্ণ অহং।

সেলিম আল দীনের নাটকে *মনসামঙ্গল* কাব্যের বিপরীত দিকটি উন্মোচিত। সেখানে বাসররাতে গৃহবধূটি সাপের কামড়ে মারা যায়। স্বামীটি প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং হিংস্র সাপের মাঝখানে প্রশান্ত জলস্রোত দেখতে পায়। (সেলিম, ২০১১ : ১০৩) সাপটিকে ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে মানবিকতার ব্যাখ্যা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তিনি। শম্ভু মিত্র সরল-কাহিনিতেই রাজনৈতিক ব্যাখ্যা স্থাপন করতে পেরেছেন। তাঁর নাটকে চাঁদ নিষ্পেষিত-নিঃশেষিত বণিক আর মনসা ক্ষমতালোভী নব্য শাসকচক্রের শিরোনেত্রী।

শম্ভু মিত্রের চাঁদের মধ্যে রয়েছে সংগ্রামের ওপরে সমীপবর্তী প্রেম, আত্মসত্তার সন্ধান, ক্লেদাক্ত মেকি জীবনের বিপরীতে কলুষমুক্ত প্রেমের অভীপ্সা :

> বুঝ্যেছ বেহুলা, জয়ের পরেই অনিবার্য ঘটনাশৃঙ্খলে সেই জয়টারে যেন পরিহাস্য কর্য্যে তোলে মহাকাল অমোঘ নিয়মে। তার চ্যায়া ঢের ভালো, তুমি, আমি, আমাদের ভালোবাসা। সামান্য মানুষ হয়্যা সামান্য অঙ্গনে শুধু অসামান্য ভালোবাসা আশ্লেষে রাখুক। বাঁচাও আমারে তুমি বেহুলা আমার ... (শম্ভু, ১৯৯৪ : ১০২)।

এই প্রেমের মধ্যে জীবনের আলোকিত প্রেরণা খুঁজে পায় বেহুলা-লখিন্দরও। *চাঁদ বণিকের পালায়* বেহুলা যেন শান্তির পায়রারূপী পুত্রবধূ। বেহুলাকে সংগ্রামসাগরের মধ্যে অপরূপ দ্বীপ হিসেবে পেতে চায় লখিন্দর। আল মাহমুদেরও চরম আস্থা বেহুলার প্রেমে কিন্তু সেখানে প্রেম এক নতুন চেতনা-আকাঙ্ক্ষী। তাঁর লখিন্দর মৃত্যুবিষে আক্রান্ত হয়ে বেহুলাকে বলছে, 'অঘোর ঘুমের মধ্যে ছুঁয়ে গেছে মনসার কাল/লোহার বাসরে সতী, কোন ফাঁকে ঢুকেছে নাগিনী,/আর কোনদিন বলো, দেখবো কি নতুন সকাল?' (মাহমুদ, ১৯৮০ : ১৩৬)। নাট্যকার জিয়া হায়দার একগুচ্ছ কবিতায় দেখিয়েছেন লোহার দেয়ালঘেরা নিচ্ছিদ্র বাসরঘর লখিন্দরের ভালো লাগে না। অবশেষে লখিন্দর অন্ধকার বাসর ঘরে একটি আলোর রেখা দেখতে পেলেও তাঁর পিতা চাঁদ মনসার পূজা দিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় ও আপস করে। সমালোচকের মতে, মনসার কাহিনিভাবনায় জিয়া হায়দারের কোনো 'আধুনিক বোধ' তৈরি হয় না। (অশ্রুকুমার, ২০০০ : ১৪২)। শম্ভু মিত্রের চাঁদ মনসার পূজা দেয়াকে নিছকই শিবের লীলা বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে আলোর কাছে অন্ধকারকে সে তুচ্ছজ্ঞান করে।

রফিক আজাদের কবিতায় এযুগে প্রাণদায়িনীর অভাব ব্যক্ত হয়, 'এ যুগে বেহুলা নেই, ঘরে ঘরে ঘরে শুধু লখিন্দর/চাঁদ বেনে বৃদ্ধ বাপ বিছানায় বানপ্রস্থে; আর/ভ্রাতৃবর্গ ডুবে গেছে বিপরীত বাণিজ্যবাতাসে ...' (রফিক, ১৯৭৬ : ১৭৬)। শক্তি চট্টোপাধ্যায় *নব মনসার পালা* কবিতায় দেখাচ্ছেন — 'গরিব মরিবে এবে গোরার দংশনে' (শক্তি, ২০১৩ : ২৬৮)। এ দুজন কবির কবিতায় চাঁদ-পরিবার রূপান্তরিত ও দারিদ্র্যের-শোষিতের প্রতীক। কিন্তু শম্ভু মিত্রের চাঁদ *মনসামঙ্গল* অনুযায়ী স্বরূপে অবস্থান করেই নতুন পরিচয়ের অধিকারী হতে পেরেছে। হুমায়ূন আহমেদ ষাটের দশকে লেখা *বাসর* কবিতায় বদ্ধ লিফট-কে

বেহুলার বাসর ঘর বলে বিজ্ঞানের সঙ্গে মিথকে মিশিয়ে দিয়েছেন। (সৌমিত্র, ১৯৯৯ : ৯৯) বিজ্ঞানযুগে শম্ভু মিত্রের আধুনিক চিন্তা *চাঁদ বণিকের পালায়* ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয় না বরং এ নাটকে সমকালের রাষ্ট্রিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিমানুষের বীরত্ব ও লড়াইকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। এ প্রসঙ্গে জগন্নাথ ঘোষের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> শাঁওলী মিত্র তাঁর 'বীরত্ব ও পাড়ি'র আখ্যান শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'শম্ভু মিত্র চাঁদ বণিকের সেই শিবের ভজনাকে সত্যের আরাধনার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ সেই যুগের ঘটনা যখন মনসার পূজা মানুষকে আদেশ দিচ্ছে বিনা প্রশ্নে ভবিতব্যকে মেনে নিতে। যে যুগে 'বীরত্ব' বা 'লড়াই' এর মর্যাদা নেই, যে যুগ বলছে আলোতে 'আবিল করো অন্ধকার'। ... তাই একই সঙ্গে এই নাটক বর্তমান কালের এবং আবহমান কালের। (জগন্নাথ, ২০০৫ : ৪৬)

শম্ভু মিত্রের চাঁদ সদাগর এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি। সে যেন সেলিনা হোসেনের *চাঁদ বেনে*'র মতো চারদিকে শত্রুকে রুখতে চায়; যার এখন কেবল 'রোখার সময়'। সে জিতবে, না হারবে, — জানেনা, তবু লড়াই করেই মরতে চায়। তার মনে হয়, 'আমি এই চম্পাইগঞ্জের স্বাধীন মানুষ। আমি এখন ধনপতি বণিক। আমার জাহাজভরা সাহস আর শক্তির পণ্য আছে। ... আমি নিঃশেষ হই না' (সেলিনা, ২০১৩ : ২২২)। সেলিনা হোসেন চাঁদকে দেখিয়েছেন নিতান্তই এক সাধারণ শ্রেণীর মানুষ হিসেবে। তার বংশীয় পরিচয়ের চেয়ে সংগ্রামী পরিচয় মুখ্য। কিন্তু শম্ভু মিত্রের চাঁদ অভিজাত-সম্ভ্রান্ত বণিক, প্রেমিক পতি, প্রেরণাদাতা পিতা, স্নেহশীল শ্বশুর, দৃঢ়চেতা শিবভক্ত; অথচ নিষ্ঠুর নিয়তির চক্রে অসহায় মানবসন্তান। ষাটের দশকে সচেতন মুক্তিকামী শিক্ষিত আত্মা যে বিপর্যস্ত হয়েছিল চাঁদ তাদের প্রতিনিধি। সে মধুসূদনের রাবণের মতো জীবনে সদগুণের সমাবেশ সত্ত্বেও জীবনযুদ্ধে পরাজিত। সে দেবতার হাতের ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র। চিত্রাঙ্গদা রাবণকে ভর্ৎসনা করেছিল এভাবে :

> কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
> কোথা সে অযোদ্ধাপুরী? কিসের কারণে,
> কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
> রাঘব? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত, ...
> কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
> লঙ্কাপুরে? (মধুসূদন, ২০১২ : ৪০)

চাঁদ বণিকের পালায় সনকাও একইভাবে চাঁদ সদাগরকে ভর্ৎসনা করে :

> ... এই সদাগর বংশ তোমাদের একদিন গ্রামের নায়ক ছিল, প্রধান কুলিক বল্যে প্রতিপট্যে নাম লিখা হ'ত। আজ কেন এত হতাদর? কেন অকারণ তোমার সাধের ঐ গুয়াবাড়ী, আহা, অতগুলি ফলন্ত প্রসূতি গাছ, অতো ফুল, ফল, মূল সব অকারণে একদিনে নষ্ট হয়্যা গেল? শঙ্কর গারুড়ী, — সেও কেন আচম্বিতে সর্পাঘাতে মর্যে গেল? কেন আমাদের অর্থের সামর্থ্য এতো কম হয়্যা গেল? কেন? পাপ তো করিনি কোনো। ... (শম্ভু, ১৯৯৪ : ২৪)

আপাতদৃষ্টে মনে হয় সংলাপদুটোর ভাব একই। কিন্তু মধুসূদনের প্রতি চিত্রাঙ্গদার অভিযোগ সরাসরি সীতাহরণকেন্দ্রিক। কিন্তু সনকা তাদের পরিণতির কারণ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত।

মনসার ক্রোধ নাকি চাঁদের অহঙ্কার তাদের পতনের কারণ তা সনকা বুঝতে পারে না। সনকা যখন চাঁদকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করে তখন চাঁদ জানায় সে শিবভক্ত, সত্যের পথিক, জীবনে জ্ঞানের আলো প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সর্বস্ব খুইয়েও চ্যাংমুড়ী কানী মনসার পূজা করেনি —.এটাই তার পরিচয়। সনকা মানতে পারে না। সনকা বলে শুধু এটাই চাঁদের পরিচয় নয়। চাঁদ 'অহঙ্কারী', এটাও তার পরিচয়। শিব সেখানে উপলক্ষ মাত্র। চাঁদ তা জানে না। সে শুধু জানে সত্যের পথে থাকলে বাধাবিঘ্ন অনিবার্য। একইভাবে রাবণ সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন :

> আপন দুর্ভাগ্য সম্পর্কে রাবণ সুনিশ্চিত, তবুও এর কারণ তাঁর কাছে অজ্ঞাত, শুধু একটা অশুভ দুষ্টগ্রহ যে তাঁর জীবনের, তাঁর সংসারের, সমাজের, রাষ্ট্রের ধ্বংস নিয়ে তাঁর ভাগ্যকে বিপর্যস্ত করে চলেছে তার গতিবিধি সম্পর্কে রাবণ সচেতন; কিন্তু কক্ষপথের গতি রুদ্ধ করবার শক্তি রক্ষঃরাজ রাবণের নেই। (নীলিমা, ১৯৬৮ : ৬০)

রাবণ সম্পর্কে উক্ত মন্তব্যটি চাঁদ সদাগর সম্পর্কেও প্রযোজ্য। 'পূর্ব বাংলার বৈরী পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে টিকে থাকার প্রতীকী-ভাষ্য চাঁদ সদাগর ও বেহুলা–দু'জনেই প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে নিত্য সংগ্রাম করেছে' (সাঈদ, ২০০১ : ৮৬)। সেন রাজাদের নিম্নশ্রেণীর আনুকূল্যে বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু ভাস্কর্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় অনেক দেবদেবী অভিজাত দেব-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। মনসা দেবী তাদেরই অন্যতম। কিন্তু শৈবভক্ত অভিজাত বণিকরা এসব দেবীকে অস্বীকৃতি জানায়। তদুপরি তাদের বাণিজ্যশক্তিরও বিনষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয়। তাদের টিকে থাকার সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে ওঠে। চাঁদ সদাগর এমনই এক প্রতিবেশধৃত সংগ্রামী পুরুষ। এজন্য সম্ভবত আহমদ ছফার অনুকরণপুরোধা অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, 'চাঁদ সওদাগর চরিত্রের এই যে ঋজুতা এইডা অইল সমুদ্র-বাণিজ্যশক্তির প্রতীক।' (ছফা, ২০১৩ : ৪৮)। এই শক্তি আর সম্ভ্রান্ত শ্রেণির দম্ভ শম্ভু মিত্রের চাঁদ সদাগরের মধ্যে প্রতিফলিত। এ নাটকে ট্রাজিক নায়ক চাঁদ যেন রাবণ, আর মেঘনাদ যেন লখিন্দর।

৮

ট্রাজিক নায়কের মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রবলভাবে বিরাজমান থাকে। এ মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদা সে দৃঢ়চেতা। জীবনসংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ট্রাজিক চরিত্র অনুভব করে সে ন্যায়বোধকে বিসর্জন দিলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। এদিক থেকে শম্ভু মিত্রের চাঁদ সদাগর ন্যায়বোধকে বিসর্জন না দিয়ে শাস্তির মুখোমুখি হয়েছিল, পরে ন্যায়বোধকে বিসর্জন দিয়েও সে শাস্তি থেকে বাঁচতে পারেনি। অমোঘ নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে অনিবার্য ট্রাজিক পরিণতি[৬] ঘটেছে তার। ''রাজা' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুব লিখেছিলেন, 'সুরঙ্গমার প্রতি রাজা নিষ্ঠুর হয়েছিলেন তাকে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পথ থেকে ফেরাবার জন্য'। কিন্তু ঠাকুরদা তো নষ্ট হচ্ছিলেন না। একে-একে তাঁর পাঁচটি ছেলে কেড়ে নেওয়া তবে কেন? কিসের জন্য? তার কোন উত্তর নেই' (আবু সয়ীদ, ১৪০৭ : ১৫০)। *চাঁদ বণিকের পালায়* চাঁদের ছয় সন্তান কেড়ে নেওয়া হল কেন, কেন

তার সপ্তডিঙা মধুকর ডুবে গেল, কেন তাকে সর্বস্ব খুইয়ে বন্ধকি বাড়িতে বাস করতে হয় চাঁদ তা জানে না। সে শুধু এইটুকুই জানে সত্যের পথে থাকলে জয় আসে না। তাকে শুধু বলতে শোনা যায় : 'এই দেশ যেন কতো ছোট হয়্যা গেছে, তাই নয়? শ্বাস নিতে যেন কষ্ট বোধ হয়' (শম্ভু, ১৯৯৪ : ২৭)। অজিতকুমার ঘোষও এই চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, 'অবশেষে রহিল শুধু ব্যর্থ, সর্বরিক্ত আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত এক মহাবনস্পতি। কিন্তু কেন? কি ভুল, কি অপরাধে তাহার এই শূন্যময় পরিণতি?' (অজিতকুমার, ২০০৫ : ৪৫১) এই প্রশ্ন উত্থাপনেই নাটকটির ট্রাজিক আবেদন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে বেহুলা-লখিন্দরের বিষপানে মৃত্যুও নিছক নয়। তাদের মৃত্যু চাঁদের জীবনে ফেলেছে বিষাদের কালো ছায়া। নায়কের এই অন্তরের শূন্যতা ও বেদনা-বিধুর জীবনচিত্র পাঠকচিত্তেও বেদনার ঝড় তোলে। আদর্শের বিশাল অঙ্গনে চাঁদ সদাগর, লখিন্দর, বেহুলা কেউই খাটো নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের পারিবারিক বিনষ্টি এক করুণ পরিণতি অনিবার্য করে তোলে, তেমনি শূন্যতার হাহাকারেও পর্যবসিত। পরাজয়ের বিনিময়ে অর্জিত পুত্রও যখন আত্মহত্যা করে তখন চাঁদের জীবনে ট্রাজেডি ঘনীভূত হয় : 'এটাও বিফলে গেল। — পূজা দেওয়া হোল। তবু যেন পূজা দেওয়া হয় নাই। পাড়ি দিয়্যেছিনু, তবু যেন পাড়ি দেওয়া হয় নাই। ঘর বেন্ধেছিনু, তবু যেন ঘর বান্ধা হয় নাই' (শম্ভু, ১৯৯৪ : ১২৮)। বেঁচে থেকেও মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে চাঁদ বণিক। তবে চাঁদ মৃত্যুপুরী থেকে পুনরায় সাগর পাড়ি দেয়ার মধ্য দিয়ে শিবসত্তা তথা জ্ঞানের আলোময় জগৎ আবিষ্কারের চেষ্টা করে : 'আমরা ক'জনা প্রেতের মতন চিরকাল পাড়ি দিয়্যা যাব। আমাদের কেউ নাই, কিছু নাই। নোঙর তো কেট্যে দেছে শিব। ... এ আন্ধারে চম্পকনগরী তবু পাড়ি দেয় শিবের সন্ধানে। পাড়ি দেও – পাড়ি দেও –' (শম্ভু, ১৯৯৪ : ১২৯)।

৯

চাঁদ বণিকের পালা রচনার ক্ষেত্রে 'বাঙালি' নাটকের চেহারা গড়ে তোলার প্রয়াস লক্ষণীয়। নাটকের নামকরণে তাই শম্ভু মিত্র *পালা* শব্দটি জুড়ে দিয়েছেন। অঙ্ক বিভাজনে পাশ্চাত্য শিল্পকলা বর্জন করেছেন। তাঁর এ নাটক তিন পর্বে বিভক্ত। তৃতীয় পর্ব আবার প্রথমাংশ ও শেষাংশ নামে বিভক্ত। প্রথম পর্বে আলো নিভে যাওয়া ও ফিরে আসার মাধ্যমে দৃশ্যান্তর ঘটে। চাঁদের পাড়ি দেওয়ার পথ খুঁজতে খুঁজতেই প্রথম পর্বের সমাপ্তি। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের সময়ের ব্যবধান ১৫/১৬ বছর। দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে দেখা যায় লখার যৌবনের অস্থির আরম্ভ। পরাজিত চাঁদ ফিরে আসে মদের বোতল হাতে; সনকা যাকে 'অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পণ' বলে উল্লেখ করেছে। চাঁদের প্রত্যাশানুসারে লখাকে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার অর্থাৎ আলোক যাত্রার মধ্যে দ্বিতীয় পর্বের পরিণতি। তৃতীয় পর্বের প্রথমাংশে সূত্রধার, জুড়িদের গানে জানা যায় লখিন্দরের বাণিজ্যযাত্রার বিশাল আয়োজন চলছে। তার পূর্বে তাকে বিয়ে দেয়ার কথা পাকাপাকি করে চাঁদ। মনসার চক্রান্তে লখিন্দরের বিষনিদ্রাকোলে ঢলে পড়ায় অর্থাৎ অন্ধকারের জয় ঘোষণায় এ পর্বের শেষ। তৃতীয় পর্বের শেষাংশের শুরুতে আলো আর আঁধারের জালে বিপর্যস্ত পরিবারের জন্য চাঁদের হাহাকার। সর্বান্তে সম্পূর্ণ অন্ধকার মঞ্চে ছবির পুরোনো নাবিকদের পুনরায় যূথবদ্ধ আবির্ভাব ও

ছায়ামূর্তির মতো রং-বর্ণিল যাত্রার কল্পনা দৃশ্যরূপে উপস্থাপিত। বলাই বাহুল্য, মঞ্চ নির্মাণের কৌশলে প্রভাব ফেলেছে রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী*।

এটি মনসার পূজা প্রচারের ব্রতকথা নয়, একটি সংগ্রামী গোষ্ঠীর দুস্তর পারাবার পাড়ি দেওয়ার নাটক। তাই কাহিনি পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে নাটকে গুরুত্ব পেয়েছে চাঁদ তথা চম্পকনগরীতে অন্ধকার জয়ের দৃশ্য। কাহিনি একরৈখিক নয়; নানা উপকাহিনি ভিড় করেছে, সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে চরিত্রের নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব। কাহিনির বিকাশে রামায়ণ ও মহাভারতের আদর্শ ভেঙে নাট্যকার সম-সময়ের তাৎপর্য রচনা করেন। বল্লভ এর উক্তি :

> ইতিহাস খুল্যে দেখো, অবশেষে চিরকাল মিথ্যা জয়ী হয়্যা এল। রামচন্দ্র জানকীর উদ্ধারের লেগ্যে পণ্যযুদ্ধ করে, কিন্তুক সে জয়তো সাময়িক। প্রজাদের মিথ্যা কুৎসা শুন্যা গর্ভবতী পত্নীট্যারে পুনরায় বনবাসে দিতে হয়। ... কুরুক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ হোল, কত বীর অকাতরে প্রাণ দিল। কিন্তু কোথায় সে ধর্মরাজ্য? (শম্ভু, ১৯৯৪ : ১৭)।

নিঃসন্দেহে ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে প্রসঙ্গগুলো যথার্থ। বল্লভ বিত্তহীন এক অধ্যাপকের কাহিনি তুলে ধরে। অধ্যাপক স্বামী পত্নীকে ঠিকমতো আহারাদি দিতে পারেননি। পত্নী যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত। তবু তিনি এখনো জীবিত। এছাড়া বল্লভের নিজের সন্তান সূর্য গঙ্গার স্রোত থেকে একটি ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে বাঁচতে পারেনি। কালের বিপক্ষে চাঁদ যেন না যায় সে কথা বোঝাতেই বল্লভ এই ঘটনাগুলো উল্লেখ করে। চাঁদ তখন যুক্তি দেখায়, সূর্য মরে গিয়ে তো একজনকে রক্ষা করেছে সেতো একটি বীজ যা বৃক্ষে পরিণত হবে। এভাবে উপঘটনাগুলো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। চরিত্রগুলোর একটি বিরাট অংশ বিকশিত হয়নি, তবে তারা কাহিনির গতিতে বিঘ্নের সৃষ্টি করে না। অগুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে ন্যায়নীতির ধ্বজাধারী বল্লভের ক্ষমতাবানদের কাছে নতজানু প্রকৃতি, ন্যাড়ার একনিষ্ঠ চাঁদ-ভক্তি, বেণীমাধরেব ফন্দিফিকির করে ক্ষমতায় আরোহণ এবং মতলববাজী দল সৃষ্টি করে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার ঘটনায় চরিত্রগুলো বিকশিত হয়েছে। নরহরি, করালীচরণ, বনমালী, সুয়া, কেবট্ট সর্দার, লটবর, লহনা, ভুলুয়া, তারাপতি কর্মকার, ভয়িল, শিবদাস, বিভুদাস, ভবদেব, দঙ্গদাস, ভিড় ইত্যাদি চরিত্র দুএকটি সংলাপে কাহিনিতে ভূমিকা রাখে। এছাড়া অসংখ্য লোকের নানা প্রসঙ্গে সমাবেশ ঘটিয়েছেন তিনি যাদের নাম না দিয়ে সংখ্যায় (রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবীর* অনুরূপ) — প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, মেয়েরা, যুবকেরা, জুড়ি, সূত্রধার, ঘোষক, পরামর্শদাতারা, অপর দিক থেকে, লোকটি — এভাবে ব্যবহার করেছেন। নাটকটির শুরুতে তাই কোনো নির্দিষ্ট চরিত্রলিপি নেই।

সংলাপ নির্মাণে নাট্যকারের আবেগের প্রাধান্য বিদ্যমান। কাহিনির সূত্র ধরে বগুড়ার মহাস্থানগড় থেকে আসামের চম্পকনগরীর বাংলা কথ্য ভাষার একটি সুর ক্রিয়াপদের গঠনে (কর্য়ে, বস্যে, চল্যেছে, নিয়্যা, বাঁচায়্যা, এইগুল্যা ইত্যাদি) লক্ষণীয়। শব্দ ব্যবহারে পুরোনো তৎসম, আরবি, ফারসিসহ বহু মৃত শব্দকে আলোয় নিয়ে আসার দিকে শম্ভু মিত্র মনোযোগী। তাই তাঁর সংলাপ প্রাথমিকভাবে পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। যেমন : প্রথম পর্বে — গুল্ম, আতিপাতি, দুরুস্তর, রত্তমতি, সুপ্পার, তত্রাৎ, তাম্বপন্নির, নিডরিয়া, তর্পণ, ইয়াদ (ফা), নাটুয়া, সাঁড়াসাঁড়ি, নিয্যস, সাবহিত, বাতুল, ব্যাদড়, বাহবাস্ফোট,

ন্যাকার আখট, আরব্ধ, অটোপটঙ্কার, জড়চ, লালচ, আকড়বাজ, তাম্বুল, কিরাত প্রহরী, রড়, নেউট্যা, পরাত, ভেট, পুরুষপুঙ্গব; দ্বিতীয় পর্বে–বেণাণী, লগুড়, ঝটিতি, তিয়ড়ি, রেকাবি, ভর্তা, মুকুর, ভেট্যে, সদসৎ, অপগত; তৃতীয় পর্বে (প্রথমাংশে)–অটবী, তুঙ্গশীর্ষ, চার্বাকীয়, নিছনি, নির্মন্‌ছন, শিশ্ন এবং তৃতীয় পর্বে (শেষাংশ)–অবকথা, সঙরিয়া ইত্যাদি অপ্রচলিত শব্দ সচেতনভাবে তিনি ব্যবহার করেছেন। লক্ষণীয়, প্রথম পর্বের তুলনায় পরবর্তী পর্বগুলোতে অপ্রচলিত শব্দের সংখ্যা কমেছে। আবার বাপপিতেমহদের দল, ফিরেফির, ব্যগ্‌গোতা, ধূর্ত্যামি, নিচ্চয়, আঁটকুড়ীর পুয়ো, চিন্তোতে, হেতাত্থে, হারুয়ার মালা, মুনিষ খ্যাটাই, আগুত এরকম অনেক আঞ্চলিক শব্দও *চাঁদ বণিকের পালায়* পাওয়া যায়। এ নাটকের অসংখ্য গান একদিকে নাট্যকারের জীবনদর্শন তুলে ধরে অপরদিকে নাটকের গতিকে, লক্ষ্যকে স্পষ্ট করে :

শুনরে নাইয়া বন্ধু
(তুমি) দিয়া জ্বালি রাখো,
আন্ধার সাগরে তুমি হাল ধর‍্যা থাকো।
(তুমি) দিয়া জ্বালি রাখো ॥
বইঠা চাল্যাও (সবে) বইঠা চাল্যাও
প্রাণের নাইয়া, তুমি, পাল তুল্যা দাও।
আন্ধার মাঝারে তুমি, দিয়াটি জ্বালাও ॥ ইত্যাদি। (শম্ভু, ১৯৯৪ : ৩৪)

অসংখ্য দীর্ঘ সংলাপ, অপ্রচলিত শব্দ, অজ্ঞাত প্রসঙ্গ নাটকে দর্শকদের মনোযোগ ধরে রাখতে কিছুটা ব্যর্থ হয়। *চাঁদ বণিকের পালায়* এ অভিযোগ থেকে শম্ভু মিত্রের মুক্তি নেই। এ কারণে সম্ভবত তাঁর জীবৎকালে নাটকটি মঞ্চস্থ হতে পারেনি। কিন্তু কাহিনির পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে অন্ধকারে আলোর অন্বেষণ করতে রাষ্ট্র ও সমাজস্থিত আলো-আঁধারির যে বিতর্ক, ন্যায়নীতির যে দ্বন্দ্ব তিনি ধরতে চেয়েছিলেন সে বিচারে এবং শব্দ ব্যবহারে, ভাষার বোধগম্যতায় তিনি সম্পূর্ণভাবে সফল।

১০

কাব্যাকারে লিখিত না হলেও *চাঁদ বণিকের পালায়* কাব্যনাট্যের লক্ষণ সুস্পষ্ট। কাব্যনাট্যে যে মহৎ চিরায়ত জীবনবোধ লিরিকের সুরস্পর্শে দ্যোতিত হয় তা এ নাটকে বিদ্যমান। পাত্রপাত্রীরা অভিজাত এবং ভাবমণ্ডিত আর তাদের সংলাপও আবেগস্পন্দিত। এ ধরনের সংলাপের মাধ্যমে কাব্যই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে: যেমন, বেহুলার সংলাপ : 'এইটুকু শেষমাত্র সম্বল আমার। তোমারে ব্যাগ্‌গোতা করি। বাসরের রাত্রে তুমি যেই বেহুলারে দেখ্যেছিলে, সেই পরিচয়টাই যেন থাকে চিরকাল। আমারে ব্যাঁচালে আজ আমারেই হত্যা করে, এইটুকু ভেব্যে দেখ তুমি।' (শম্ভু, ১৯৯৪ : ১২৭) চাঁদের চিত্তে একদিকে স্বদেশবোধ, ধর্মবোধ, বংশীয় ঐতিহ্য রক্ষার আকাঙ্ক্ষা অন্যদিকে পুত্র-পরিবার রক্ষার উদগ্র বাসনায় গীতিকাব্যের ব্যঞ্জনা ও দীপ্তি প্রকাশিত। কাব্যনাট্যে মানবজীবনের যে শাশ্বত রূপ প্রত্যাশিত যেমন চাঁদের মতো ব্যক্তিত্ববান পুরুষ পরাজিত হলেও নিঃশেষ হতে চায় না তা-ও এ নাটকে লক্ষ্যযোগ্য। পিতৃহৃদয়ের হাহাকার, স্বগোষ্ঠী ও স্বধর্ম রক্ষার পটভূমিকা নাটকটিকে একটি

করুণ অথচ সুদৃঢ় মর্যাদা দান করেছে যার ফলে একইসঙ্গে নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও কাব্যরস ঘনীভূত হয়েছে। *মনসামঙ্গল* কাব্যে ছিল পয়ার-ত্রিপদীর ব্যাপক ব্যবহার। শম্ভু মিত্র তা স্মরণে রেখে, গদ্যে সংলাপ রচনা করেও তা পয়ারের বেড়িতে বেঁধে ঐতিহ্যিক ছন্দকাঠামোকে পুনর্জীবিত করেছেন। তাঁর অনেক সংলাপের পদ্যকে ১৪ মাত্রার পয়ারে সাজানো যায় অনায়াসে :

উপরে বিধাতা আছে,/আর নীচে সব
ভালো থিক্যা ভালোতর/হ'য়েই চল্যেছে।
তাই বলি চন্দ্রধর,/নিজেরে বাঁচ্যাও।... (শম্ভু, ১৯৯৪ : ৫৮)

তাঁর সংলাপে যেমন আছে গদ্যের বৈভব তেমনি আছে কাব্যিক লয়। 'চেঙমুড়ী কানী','কুলিক','গুয়াবাড়ী' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে কাহিনির মধ্যযুগীয়তার আবহ থাকলেও ব্যক্তিক ভাবোচ্ছ্বাসে তা আধুনিক গীতিকবিতার রূপ লাভ করে। এখানেই নাট্যকারের মধ্যযুগীয় অলৌকিকতা থেকে ইতিহাসে প্রত্যাবর্তন, অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রার প্রয়াস সঙ্গতি লাভ করে।

১১

বস্তুত, সম-সময়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন পটভূমিতে লোভী মানুষ যখন কুচক্রের জঞ্জাল জড়ো করে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে তখন সংগ্রামী সত্তা সেই ভাণ্ডার গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে উদ্ভাসিত করতে চাইছে নতুন সূর্যকিরণ। *চাঁদ বণিকের পালায়* পুরাণ-রথে চড়ে শিল্পসন্ধানী শম্ভু মিত্রের সেই পথেই মহাযাত্রা। এ যাত্রায় তিনি একজন শুধু সফল শিল্পীই নন, অন্ধকারে আলোর অন্বেষণে এক নতুন পথের অভিযাত্রিক।

টীকা

১. "১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে লেখা 'কয়েকটি অভিনয়ের জন্মকথা' প্রবন্ধে শম্ভু মিত্র একটি নির্ভেজাল বাংলা নাটকের পক্ষে ওকালতি করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী* নাটকের মধ্যে বাঙালি নাটকের দেখা পেয়েছিলেন। এই নাটকের মধ্যে রয়েছে 'আদ্যোপান্ত সমস্তটাই বাঙালী' নিদর্শন। তিনি 'চাঁদ বণিকের পালা' লিখে 'বাঙালী নাটকের' চেহারা গড়ে তুললেন। তার ফলে নাটকটির নামকরণে তিনি 'পালা' জুড়ে দিয়েছেন।" (জগন্নাথ, ২০০৫ : ৫০)
"১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে লেখা 'বাংলা থিয়েটার' প্রবন্ধে শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এ পর্যন্ত বাংলার শ্রেষ্ঠ যাত্রার নাট্যকার বলে অভিহিত করেছেন।
রবীন্দ্রনাথের *বিসর্জন* নাটকের মধ্যে তিনি যাত্রার বৈশিষ্ট্য দেখেছিলেন। শম্ভুবাবু লিখেছেন,'আমরা অনেকেই যাত্রা দেখেছি ছোটবেলায় (আমি করেওছি বার আষ্টেকদশ)। সেখানে ভরা দুপুরে দুর্যোধনকে মনে হয়েছে দ্বৈপায়নের তীরে অন্ধকারে ছটফট করছে। কল্পনাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল কাব্যের। সেই কাব্য আছে রবীন্দ্রনাথের কিছু নাটকে। যেমন 'বিসর্জন'। ... যাত্রায় যখন ন্যায়-নীতির তর্ক থাকে, তখন তারা কৌতূহলী দৃষ্টিতে সেই তর্ক অনুধাবন করার মতো বুদ্ধি-প্রাখর্য তাদের (বাঙালী দর্শকদের) উৎসাহিত করে তোলে। বিসর্জন নাটকে আছে সেই ন্যায়-নীতির বিতর্ক। এই বিতর্ককে শম্ভুবাবু বলেছেন 'দেশোয়ালী'।" (জগন্নাথ, ২০০৫ : ১৮৫)

২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, 'মানুষের সঙ্গে দেবতার নতুন সম্পর্ক স্থাপন-প্রয়াসের মধ্যে মঙ্গলকাব্য অন্যতম প্রধান। যে তিনজন নতুন দেবদেবী : ধর্মঠাকুর, মনসা এবং চণ্ডী প্রধানত মঙ্গলকাব্যে পূজ্যরূপে আসন পেয়েছেন—তাঁরা অনার্য-কল্পনা-প্রসূত এবং অ-হিন্দু-উৎস-সম্ভূত বলে মনে হয়।' (বাসুদেব, ২০০৪ : ৭৯)। অন্য একজন সমালোচক দেখিয়েছেন, মনসা মূলত দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড়ভূমির দেবী এবং মূলত সে দেশের চেংমুড়ী, মনঞ্চাম্মা দ্রাবিড়জন পূজিতা সর্পদেবী। সেনরাজারা কৌলিন্য প্রথাকেন্দ্রিক বর্ণাশ্রমভিত্তিক পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিল। তাদের পক্ষে মনসার মতো এক লৌকিক দেবীকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব ছিল না। (অমিয়ভূষণ, ১৯৮৮ : ১১১)

'বণিক সম্প্রদায়কে দিয়ে অনার্য মেয়ে দেবতার পূজো আদায় থেকে মনে হয় যে, তৎকালীন সমাজে বণিক সম্প্রদায়ই ছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-সংস্কৃতির প্রধান সহায়ক ও ধারক'। (অরবিন্দ, ১৯৯৪ : ৬৩)

৩. পুরাণ ও লোককথা অনুযায়ী মনসাকে তার পিতা শিব ও স্বামী জগৎকারু উভয়ই প্রত্যাখ্যান করেন। সৎ-মা চণ্ডী (এ ক্ষেত্রে পার্বতীর নামান্তর) তাঁকে ঘৃণা করেন। এ কারণে মনসা সর্বদা নিরানন্দ ও বদরাগী। প্রথম দিকে দেবতারা মনসার দেবীত্ব স্বীকার করেননি। এ কারণে মনসাকে নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়। ঘটনাক্রমে দেবী-দুর্গা সৎ-কন্যা মনসাকে তার সতীন ভেবে বেদম প্রহার করেন এবং লাঠির আঘাতে তার একটি চোখ অন্ধ হয়ে যায়। (সাইমন, ২০০৮ : ৯২)

৪. "কবিশেখরের কবিতায় দেখি চাঁদ-এর পৌরুষত্বের স্বীকৃতি : 'সান্তালী পর্বতপরে/হিন্তালের যষ্ঠি করে/দৃপ্ত দীপ্তি তোমার পৌরুষ ...। সেখানে চম্পকনগর হয়ে উঠে আধুনিক বিশ্বসংসার আর কানীর আধুনিক চক্রান্তের প্রক্রিয়ারতো শেষ নেই। আর চক্রান্তের নিশীথ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই কবিতার চাঁদ হয়ে ওঠে সেই মানুষ যে লখিন্দর-বেহুলার জন্য, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন দেখে সুন্দরতর কল্যাণময় পৃথিবীর।" (অশ্রুকুমার, ২০০০ : ১৪৩)

৫. এ নাটকে বেহুলার ওপর *রক্তকরবীর* নন্দিনীর প্রভাব লক্ষ্যযোগ্য :

'রক্তকরবীর গুচ্ছে নন্দিনীর ভালোবাসা সূচিত হয়েছিল। ওই রক্তকরবীর গুচ্ছেই নন্দিনীর সংগ্রামী চেতনা প্রতিফলিত হচ্ছে। ওই ফুলের মঞ্জরীতেই উঁকি দিচ্ছে দিনবদলের লড়াই। অধ্যাপক দেখেন নন্দিনীর কপোলে রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয় গোধূলির মেঘের মতো অগ্নিসম্ভব হয়ে উঠেছে। ... যেন তার সিঁথির সিঁদুর সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে'। (মৃদুল, ২০০৭ : ৪৮)

৬. চাঁদ সদাগরের পরিণতি সম্পর্কে একজন সমালোচকের কথায় ট্রাজেডির স্বরূপ ধরা পড়ে :

"Tragic চরিত্রের ভাগ্য বিপর্যয়ের মূলে থাকে তার ভ্রান্তি বা কোন একটি দুর্বলতা। গ্রিক ক্লাসিক নাটকে চরিত্রের ভ্রান্তি তার নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়তিই চরিত্রের গতিধারাকে নির্দিষ্ট করে থাকে। তথাপি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বলে নিয়তির বিরুদ্ধে tragic চরিত্র গভীর ও ব্যাপক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চরম পরিণতি লাভ করে থাকে"। (শম্ভুনাথ, ১৯৯৪ : ১৯৮)

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

মিয়ভূষণ মজুমদার, ১৯৯৭। *লিখনে কী ঘটে*, 'পদ্মাপুরাণ কথা', 'প্রাচীন সাহিত্যের মর্ম', আনন্দ, কলিকাতা।

রবিন্দ পোদ্দার, ১৯৮১। *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*, তৃতীয় মুদ্রণ, উচ্চারণ, কলিকাতা।

রবিন্দ পোদ্দার, ১৯৯৪। *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*, চতুর্থ মুদ্রণ, পুস্তক বিপণী, কলিকাতা।

শ্রুকুমার সিকদার, ২০০০। *চোখের দুটি তারা/*দুই বাংলার কবিতা, 'বারে বারে চম্পকনগর', প্যাপিরাস, কলকাতা।

য়ীদ আইয়ুব, ১৪০৭। *ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

আল মাহমুদ, ১৯৮০। *আল মাহমুদের কবিতা*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।
আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৭৫। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, এ মুখার্জী এন্ড কোং (প্রা.) লিমিটেড, কলিকাতা।
আহমদ ছফা, ২০১৩। *যদ্যপি আমার গুরু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
আহমদ শরীফ, ১৯৭৮। *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য*, বর্ণমিছিল, ঢাকা।
জগন্নাথ ঘোষ, ২০০৫। *শম্ভু মিত্রের চাঁদ বণিকের পালা*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।
তপোধীর ভট্টাচার্য/স্বপ্না ভট্টাচার্য, ১৩৯৩। *আধুনিকতা, জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব*, নবার্ক, কলকাতা।
নীলিমা ইব্রাহিম, ১৯৬৮। *বাংলার কবি মধুসূদন*, দ্বিতীয় সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।
বেগম আকতার কামাল, ১৯৯৯। *আধুনিক বাংলা কবিতা ও মিথ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
বাসুদেব রায়, ২০০৪। *মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর স্বরূপ*, পাঠকবন্ধু লাইব্রেরী, ঢাকা।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ২০১২। *মধুসূদন রচনাবলী*, ক্ষেত্রগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
মৃদুল শ্রীমানী, ২০০৭। *রক্তকরবী : নন্দিনীর খোঁজে*, পত্রলেখা, কলকাতা।
মো. জাকিরুল হক, ২০০৭। *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
মোহাম্মদ হাননান, ১৯৯১। 'মনসামঙ্গল কাব্য : চাঁদ সদাগরের শ্রেণী-চরিত্র', সাহিত্য পত্রিকা, চৌত্রিশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
রফিক আজাদ, ১৯৭৬। *কবিতাসমগ্র, জতুগৃহ*, অনন্যা, ঢাকা।
শম্ভু মিত্র, ১৯৯৪। *শতবর্ষের নাটক* (দ্বিতীয় খণ্ড), *চাঁদ বণিকের পালা*, সৈয়দ শামসুল হক, রশীদ হায়দার সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ২০১৩। *শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, সাযযাদ কাদির সম্পাদিত, *নব মনসার পালা*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা।
শম্ভুনাথ চক্রবর্তী, ১৯৯৪। *বিশ শতকের থিয়েটারে বাংলা নাটক*, কল্যাণী প্রকাশনী, কলিকাতা।
শামসুর রাহমান, ১৯৮২। *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, চাঁদ সদাগর*, ঢাকা।
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৪। *আগুন এবং অন্ধকারের নাট্য : রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
সাইমন জাকারিয়া, ২০০৮, *বাংলাদেশের লোকনাটক/বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
সাঈদ-উর রহমান, ২০০১। *সামন্তযুগে বাঙালী সংস্কৃতি : কয়েকটি প্রসঙ্গ*, 'চাঁদ সদাগরের লাঠি' ও 'হজরত মুসার আষা', *মৌলি প্রকাশনী*, ঢাকা।
সুবীর রায় চৌধুরী, ৮৩-বহুরূপী, শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকারভিত্তিক বক্তব্য, কলকাতা।
সেলিনা হোসেন, ২০১৩। *দশটি উপন্যাস, চাঁদ বেনে*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা।
সেলিম আল দীন, ২০১১। *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র, প্রাচ্য*, সাইমন জাকারিয়া সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
সৌমিত্র শেখর, ২০০৯। *ষাটের দশকের কবিতা : বিষয় স্বদেশ ও সমাজচেতনার স্বরূপ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।